আমি কিভাবে আছি : অনধিকারীর হাইডেগার চর্চা

কৌশিক জোয়ারদার

আসুন, একটু হাইডেগার চর্চা করা যাক। এখন প্রশ্ন উঠবে আলোচনা করতে এসে শিরোনামেই নিজেকে "অনধিকারী" হিসেবে ঘোষণা করা কেন? সে কথা দিয়েই শুরু করি। হাইডেগার এক অর্থে অধিবিদ্যা (metaphysics)-র সমালোচক, কারণ তিনি পূর্বসূরীদের দর্শনে একটা বিরাট ভুল থেকে গেছে মনে করেন। আবার অন্য দিকে তিনি নিজের মতো ক'রে অধিবিদ্যা, বা আরো নির্দিষ্ট ক'রে বললে, অস্তিত্ববিদ্যা (ontology)-কে বাঁচিয়ে তুলছেন। নিছক ভাষা বিশ্লেষণই দর্শনের কাজ ব'লে তিনি মনে করেন না যদিও, তবু তাঁর দর্শনের অনেকটা জুড়ে আছে ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় ইত্যাদি। এবং এই ভাষাটি জার্মান, যা আমার এক বিন্দুও জানা নেই। আমি আমার সামান্য ইংরিজি জ্ঞান নিয়ে সামান্য হাইডেগার পড়েছি। বর্তমান সময়ের অগ্রণী দার্শনিক এবং লেখক রজার স্ক্রুটন হাইডেগারের অবর্ণনীয়কে বর্ণনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাটিকে প্রায় দুর্বোধ্য বলেই মন্তব্য করেছেন। হাইডেগার সম্পূর্ণরূপে বুঝেছেন, এই দাবি নাকি কেউই করেন নি। দর্শন-ইতিহাসের দিকপাল লেখক কোপ্লস্টোনও একই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে হাইডেগারের দর্শন দ্ব্যর্থক এবং রহস্যময় হওয়ার কারণে তাঁর পক্ষে সবসময়েই দাবি করা সম্ভব যে, তাঁকে কেউই বোঝে নি। শোনা যায় যে একবার তাঁর অধিবিদ্যা সম্পর্কে বক্তৃতার শেষে ক্ষণিক নৈঃশব্দের পর জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন "কিন্তু হের হাইডেগার, অধিবিদ্যা কি?" হাইডেগার বলেছিলেন "ভালো প্রশ্ন।" এদিকে এসব শুনলে পরে হাইডেগার সাহেব যে খুব রাগ করতেন, সেটাও কিন্তু নয়। জীবনের জটিলতাকে দর্শন সহজ ও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেবে এই ধারণা করলে ভুল হবে ব'লেই তিনি উল্লেখ ক'রেছেন। উল্টে তিনি বলছেন, দর্শনের স্বভাবই হলো বিষয়কে দুরূহ ক'রে তোলা। কাণ্ডজ্ঞান দার্শনিক সত্যের প্রতি অন্ধ ও বধির, তাই সহজবুদ্ধির সাথে দর্শনের বিরোধ। এইসব কারণেই নিজেকে "অনধিকারী" বলেছি। কঠিন জিনিস সহজ ক'রে বুঝে সহজতর ক'রে বোঝানোর কাজটাই ব্যর্থতার সাথে ক'রে যাই কিনা প্রত্যহ!

কিন্তু হাইডেগার পড়তে হবে। তাঁর নাজি সংসর্গটি তাঁর দর্শনের থেকে বড় ক'রে দেখলে সেটা না-পড়ার একটা অজুহাত মাত্র হবে। দর্শন ও সাহিত্যের সীমারেখা অস্পষ্ট ক'রে জ্ঞান চর্চার এক নতুন ভাষ্য রচনা করলেন তিনি। তিনি যদি "অস্তিত্ব ও সময়" না লিখতেন, সার্ত-এর অস্তিত্ব ও শূন্যতা -ও লেখা হতো না। জাক দেরিদা, যার উপরে

হাইডেগারের প্রভাব তিনি নিজেই স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন, মনে করেন যে হাইডেগারকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আর আপনার যদি আত্মজিজ্ঞাসা থাকে, যদি চিন্তা করতে ভালোবাসেন, তাহলে অবশ্যই হাইডেগার পড়তে হবে আপনাকে। আমিও আমার সীমাবদ্ধতা নিয়ে এইসব কারণেই তাঁকে পড়েছি যতটা সম্ভব। আর যেমন বুঝেছি, লিখতে ব'সেছি যোগ্যতর ব্যক্তির যদি এতটুকুও কাজে লাগে, এই ভেবে।

হাইডেগারের দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন কাহিনি ফেঁদে বসা ওঁর খুব একটা পছন্দ হবে না বোধ ক'রি। দার্শনিকদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের জীবনী প্রসঙ্গে তিনি নিজে অত্যন্ত মিতভাষ। একবার অ্যারিস্টটল প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন এই ব'লে "অ্যারিস্টটল জন্মালেন, কাজ করলেন এবং প্রয়াত হলেন"। ব্যাস, তারপরেই অ্যারিস্টটলের দর্শনে চ'লে গেলেন। আমাদের কৌতুহল অত সহজে নাও মিটতে পারে ভেবে সামান্য কয়েকটি তথ্য নিবেদন করি। দার্শনিকের জীবন ও দর্শন একেবারেই যে সম্পর্কহীন, অনেকেই তা মনে করেন না। মার্টিন হাইডেগারের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ সালে, জার্মানীর মেসকির্ক অঞ্চলে। একদম ছেলেবেলাটা কেটেছিলো ধর্মীয় আবহে, ১৯০৭ সালে এক পাদ্রীর কাছ থেকেই পেলেন অ্যারিস্টটলের সত্তার উপর ফ্রানৎস ব্রেন্টানো-র লেখা একটি বই। ভবিষ্যতে যে দার্শনিক প্রশ্নকে ঘিরে তাঁর সমূহ কাজ, তার বীজ উপ্ত হয়ে গেল এই সময়েই। ১৯০৯ সালে ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের পাঠ নিচ্ছিলেন। এই সময়েই পড়ে ফেললেন হুসার্লের লজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন্‌স। ১৯১১ সালে ধর্মতত্ত্ব থেকে দর্শনশাস্ত্রে সরে এলেন, কবিতাতেও আগ্রহ এই সময়েই। পড়লেন কিয়ের্কেগার্দ, নীৎশে, দস্তয়েভস্কি, হোল্ডারলিন, রিলকে। ১৯১৪ এবং ১৯১৭ সালে দুবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যদিও স্বাস্থের কারণে তাঁর এই যোগ ছিলো সংক্ষিপ্ত। ১৯২৩ সালে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-জীবনের সূত্রপাত। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ অস্তিত্ব ও সময় (Being and Time)। ১৯২৮ সালে ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হুসার্লের অবসরের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন হাইডেগার। প্রিয় শিষ্যের এই নিয়োগে হুসার্লের অনুমোদন ছিলো, হাইডেগার তাঁর অস্তিত্ব ও সময় হুসার্লকেই উৎসর্গ করেছিলেন, "বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ"। উভয়ের মতদ্বৈততাও কম ছিলো না, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের পর গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মতান্তরের এ হলো দ্বিতীয় নিদর্শন। ১৯৩৩ সালে হাইডেগার নাজি-পার্টির সদস্য হলেন, ওই বছরেই নিযুক্ত হলেন ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে। রেক্টর হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণে হিটলার ও তার নীতির প্রতি নিজের সমর্থন গোপন করেন নি। এক বছরের মধ্যেই (১৯৩৪) নতুন পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগের কারণ অস্পষ্ট, একটি মতে হাইডেগার দুজন নাজি-বিরোধী সহকর্মীকে বরখাস্ত করতে রাজি না হওয়াতেই বিরোধ। কিন্তু এটাও ঠিক, হাইডেগার প্রকাশ্যে হিটলারের নিন্দা কখনোই করেন নি। অন্যদিকে হুসার্ল একজন ইহুদী হলেও হাইডেগার কখনোই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নি (কিছু অসমর্থিত রটনা অন্যরকম ইঙ্গিত করলেও)। দার্শনিক হানা আরেন্ত, যিনি হাইডেগারের প্রিয় ছাত্রী

ও দীর্ঘ সময়ের প্রেমিকা, তিনিও ইহুদী ছিলেন। যাই হোক, হাইডেগারের সাথে নাজি-পার্টির সম্পর্ক আজও এক ধাঁধাঁ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর, হাইডেগারের নাজি-যোগের কারণে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল, যদিও পাঁচের দশকের গোড়াতেই তাঁর পুনর্নিযুক্তি ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতোই, হাইডেগারের ধর্মবিশ্বাসও রহস্যময়, মূলত নিরীশ্বরবাদী অস্তিবাদী হিসেবে চিহ্নিত হলেও তিনি নিজে এই আরোপ পছন্দ করেন নি। ১৯৭৬ সালে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

যে মূল প্রশ্নটিকে ঘিরে হাইডেগারের দর্শন আবর্তিত হয়েছে, তা হলো অস্তিত্ব কি? হাইডেগারের মাতৃভাষায় বলতে গেলে প্রশ্নটি "সেইন" (sein) সংক্রান্ত, ইংরিজিতে যা "বিয়িং" (being)। এখন "বিয়িং" এর দুটি প্রতিশব্দ বাংলায় পেতে পারি, "সত্তা" এবং "অস্তিত্ব"। কিন্তু "সত্তা" বলতে আবার বস্তুর মূল ধর্ম (essence)-ও বোঝায়। "এসেন্স" বলতে দার্শনিকেরা চিরাচরিতভাবে যা বুঝিয়ে এসেছেন, মানব অস্তিত্বের প্রসঙ্গে হাইডেগার (এবং এই ধারার অন্য চিন্তকেরা) তা অস্বীকার করবেন ব'লে, "বিয়িং"-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমি "অস্তিত্ব"-ই ব্যবহার করবো। "সত্তা" শব্দেরও ব্যবহার হবে যা সৎ, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে, এই অর্থে। মনে রাখা দরকার "বিয়িং" শব্দটি আবার "সেইন"-কে প্রকাশ করতে পারে কিনা, এই নিয়েও আলোচনা কম নেই। কিন্তু আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, শুরু তো করতে হবে। প্রশ্নটি তাহলে অস্তিত্বের অর্থ নিয়ে। নাকি "অস্তিত্ব"-এর অর্থ নিয়ে? হাইডেগার কি আসলে "অস্তিত্ব" শব্দটিরই বিশ্লেষণ করতে চাইছেন? আমাদের মতে, হাইডেগারের বিবেচ্য অস্তিত্ব। কিন্তু ভাষার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায়ই নেই। হাইডেগার জানাচ্ছেন, শব্দ এবং ভাষা বস্তুর মোড়ক নয়। বরং ভাষার মধ্যে দিয়েই বস্তু অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। ভাষা বিনা অস্তিত্ব অনিকেত। আবার এমনও বলেছেন যে, পরস্পরের সাথে আলাপচারিতাতেই আমরা যা, তা হ'য়ে উঠি। প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণ ভর্তৃহরিও বলেছিলেন, ভাষা নিছক বাহক নয়, জগৎ ভাষাময়। হাইডেগারের প্রশ্নটি তাই নিছক ব্যাকরণগত নয়। যখন আমরা বলি কোনো বস্তুকে অস্তিত্বশীল ব'লি, তখন আমরা আসলে কি বলতে চাইছি?

বস্তুত ভাষার প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যখন হাইডেগার বলেন, দর্শনের চিরাচরিত ভাষা অস্তিত্বকে ধরতেই পারে নি। অস্তিত্বের নতুন ভাষ্যের প্রয়োজনে তিনি খুঁজছেন নতুন ভাষা। শব্দার্থগত এবং আধিবিদ্যক প্রশ্নদুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন, তা হলো আদৌ কিছু আছে কেন? ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বর বা সৃষ্টির প্রশ্নের যে স্থান, হাইডেগারের দর্শনে অস্তিত্বের এই প্রশ্নের সেই স্থান। বার বার ঘুরে ফিরে এই প্রশ্ন তিনি ক'রেছেন শূন্যতার স্থলে কিছু আছে কেন আদৌ? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে নয় যে তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন বা দিয়েছেন। শূন্যতা অস্তিত্বকে প্রকট ক'রে বলেই প্রশ্নটা করতে হবে। বিশ্লেষণপন্থী দার্শনিক রুডল্‌ফ কারনাপ সম্পূর্ণ ভুল বুঝে হাইডেগারের

প্রশ্নটিকেই অর্থহীন বলেছেন। হাইডেগার সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন, এবং তাঁর মতো ক'রে প্রতিষ্ঠাও করেছেন অস্তিত্বের প্রশ্নই দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অথচ এই প্রশ্নটিই মানুষ করতে ভুলে গেছে। ঈশ্বর আছেন কিনা, আত্মা আছে কিনা, জগৎ, দ্রব্য ইত্যাদি প্রভৃতি আছে কিনা এইসব প্রশ্ন দার্শনিকেরা করে এসেছেন এবং করেই চলেছেন, কিন্তু এই "আছে" মানেটা কি এই প্রশ্নটাই সে আর করে না। একে হাইডেগার বলেছেন সত্তা (অস্তিত্ব) হতে মানুষের পতন। নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হাইডেগারের এই পতনের ধারণাটি খ্রিশ্চানিটির 'স্বর্গ হতে মানুষের পতন'-কে মনে পড়িয়ে দেয়। এও আরেক ধর্মতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ। যেন এই বিস্মরণ এক পাপ। এই যে টেবিলটি আছে আবার সংখ্যাও আছে, দুয়ের মধ্যে কি এমন সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে দুই-ই 'অস্তিত্বশীল'? কিন্তু এই প্রশ্ন সে করবে না। পতন আসলে পলায়ন, অস্তিত্বের প্রশ্ন থেকে। সে পালিয়েছে কারণ তার অস্তিত্বের মুখোমুখি হতে সে ভয় পেয়েছে আর তার পলায়নকে যাথার্থ দেবার চেষ্টা করেছে কতকগুলো তত্ত্বের মোড়কে। মনে করুন দেকার্তের 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) যুক্তি'। দেকার্ত বলছেন ঈশ্বরের ধারণাটিই এমন যে তিনি সর্বগুণান্বিত। এখন তাঁর অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহলে তিনি তো আর সর্বগুণান্বিত থাকলেন না। সুতরাং ঈশ্বরের বাস্তবতা সিদ্ধ। এখন যুক্তিটি যতটা সরল মনে হচ্ছে, ততটাও সরল সে নয়। "আমি এক আজব দ্বীপের কল্পনা করলেই কি সেটা অস্তিত্বশীল?" এই ব'লে দেকার্তের যুক্তি অসার প্রমাণ করা যাবে না, কারণ দ্বীপের ধারণা এবং ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে অবশ্যই তফাৎ আছে। এই যুক্তিতে খটকা একটা আছে, এবং ইমানুয়েল কান্ট সেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন 'অস্তিত্ব' বিধেয় (predicate)-র মতো দেখালেও সেটা কোনো গুণ (property)-ই নয়। একটি অনস্তিত্বশীল স্বর্ণমুদ্রার ধারণা এবং অস্তিত্বশীল স্বর্ণমুদ্রার ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অস্তিত্ব একটা বস্তু সম্পর্কে বাড়তি কিছুই বলে না। সেইজন্যেই, ধারণা থেকে অস্তিত্ব, তা ঈশ্বরের হলেও, নিঃসৃত হয় না। তাহলে "অস্তিত্ব" বস্তু সম্পর্কে কী বলে? কান্ট বলছেন, "অস্তিত্ব" বস্তুর নির্দেশক একটি শব্দমাত্র, বস্তু সম্পর্কে কথা বলতে সাহায্য করে। রাসেল এই আপত্তিরই সম্পাদিত সংস্করণ সামনে এনেছেন। আধুনিক তর্কবিদ্যাতেও "অস্তিত্ব" পরিমাণসূচক মাত্র, কোন বিধেয় নয়। অস্তিত্ব ও সময় বইটির প্রথমেই হাইডেগার দার্শনিকদের "অস্তিত্ব"-কে অবজ্ঞা করার কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করেছেন: অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা সার্বিক, তাই শূন্যগর্ভ; "অস্তিত্ব"-কে সংজ্ঞায়িত করা যায় না; এবং "অস্তিত্ব" এতটাই সহজবোধ্য যে আলোচনারও অযোগ্য। এমনকি হাইডেগারের শিক্ষক হুসার্ল পর্যন্ত তাঁর প্রতিভাসবিদ্যা (phenomenology)-য় পদ্ধতিগত প্রয়োজনে বস্তুর অস্তিত্বকেই বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন। হাইডেগার এটাকেই বলছেন পতন, ভাষার দারিদ্রের কারণে অস্তিত্ব থেকেই পলায়ন। হাইডেগার তাই বারবার প্রাক-সক্রেটিস গ্রীক দার্শনিকদের কাছে ফিরে গেছেন। হাতিও আছে, ধারণাও আছে, সংখ্যাও আছে এই তিনের মধ্যে কি এমন সাধারণ যাতে ক'রে এরা প্রত্যেকেই "আছে"? অস্তিত্বের ভিত্তি কি? হাইডেগারের কাছে এটাই দর্শনের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

"অস্তিত্ব"-এর প্রশ্নে হাইডেগার ফিরে তাকাচ্ছেন পেছনে, অনেকটা পেছনে। কারণ মানুষ যা ভুলে গেছে, তাকে জেনেছিলো স্মরণাতীত কালে। গ্রীক ভাষায় শব্দ বা ভাষাকে বলা হয়েছে "লোগোস" (logos)। আরও নির্দিষ্ট ক'রে বললে লোগোস"-এর আদি অর্থ "উচ্চারণ"। ঈশ্বর কেবল উচ্চারণেই সৃষ্টি করেছেন সংসার, তাই বাইবেলে বলা হয়েছে আদিতে ছিলো ঈশ্বর ও লোগোস। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির মতে সৃষ্টির উৎস শব্দব্রহ্ম। গ্রীক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হবার আগে থেকেই লোগোসের ধারণাটি ছিলো, বলাই বাহুল্য। হেরাক্লিটাস এবং পারমেনাইডিস শব্দটি ব্যবহার করেছেন উচ্চারণ বা ভাষা অর্থেই। কালে লোগোস বলতে ব্যাখ্যা, যুক্তি, এবং অতঃপর যুক্তি ব্যবহারকারী মানুষের বুদ্ধিকেও বোঝানো হতে থাকলো। লোগোস থেকেই উৎপত্তি "লজিক" শব্দের। সত্তা বা অস্তিত্বের অর্থোদ্ঘাটনে হাইডেগার সম্পূর্ণ অন্যভাবে লোগোসকে বুঝতে চেয়েছেন। সত্তা, অর্থাৎ কিনা যা আছে, তার অস্তিত্বকে কিভাবে পাই? ধরা যাক বললুম, বাড়িটি ওইখানে আছে। বাড়িটির দেওয়াল, সিঁড়ি, রঙ এইসব তো দেখছি, কিন্তু অস্তিত্ব? তার সত্তা? যদি বলেন দেওয়াল, সিঁড়ি, ইত্যাদির বাইরে অস্তিত্ব ব'লে কিছুই নেই, তাহলে "অস্তিত্ব" শব্দটি "আছে'ই বা কেন? "ওইখানে বাড়ি" বললেই কি যথেষ্ট নয়? লক্ষ্যণীয়, "বিয়িং" শব্দটি বিশেষ্য হলেও, "চক", "ডাস্টার"-এর মতো তার প্রকৃতি নয়, বরং সে "ফলিং", গোয়িং" ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের মতো। কিন্তু বিয়িং তো বৃক্ষ হতে আপেলের পতনের মতোও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়? তাহলে কি "অস্তিত্ব" সত্যিই শূন্যগর্ভ?

হাইডেগার যে তা মনে করেন না, সে আমরা জেনে গেছি। অস্তিত্বকে হাইডেগার তার বিপরীতের তুলনায় বুঝতে চাইবেন। দর্শনের ইতিহাসে সত্তার দুটি বিপরীত ধারণা পেয়েছি হ'য়ে ওঠা (becoming) এবং অবভাস (appearance)। মনে করা হয় সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস কেবল হ'য়ে ওঠাকেই সত্য ব'লে মেনেছেন, পারমেনাইডিস মেনেছেন হ'য়ে ওঠার আড়ালে অপরিবর্তনীয় সত্যকে (being = essence)। যেন হেরাক্লিটাস সত্তাকে মানেনই নি, যেখানে সত্তা বলতে বস্তুর অপরিবর্তনীয় ধর্মকে বোঝানো হচ্ছে। হাইডেগার কোনো অপরিবর্তনীয় ধর্ম হিসেবে সত্তার কথা বলেন না, এবং উল্লিখিত দুই দার্শনিকের বক্তব্যের মৌলিক কোনো তফাৎও মানেন না। কেবল উভয়ের বক্তব্যের ঝোঁকটা ভিন্ন। হাইডেগার অস্তিত্বশীলতা আর হয়ে ওঠার মধ্যে কোনো মৌলিক তফাৎ দেখেন না। তবে বিয়িং এবং বিকামিং দুটো আলাদা শব্দ যখন, কিছু পার্থক্য তো আছেই তাদের মধ্য। এখানেই প্রবেশ করছে লোগোস সম্পর্কে হাইডেগারের অভিনব ব্যাখ্যা। লোগোস যেভাবে "উচ্চারণ" থেকে "চিন্তা"-য় এসে পৌঁছলো, তা হাইডেগারের মনঃপূত, কারণ তিনি ভাষা নিরপেক্ষ চিন্তায় বিশ্বাস করেন না (যদিও, ভাষার উপস্থিতি চিন্তাকে নির্দেশ নাও করতে পারে)। তিনি নতুন যেটা বললেন তা হলো লোগোস হচ্ছে "একত্রীকরণ ও ঐক্যসাধন" (gathering)। তাঁর অভিপ্রেত অর্থটিকে বোঝানোর জন্যে তিনি অন্য একাধিক শব্দ ব্যবহার করেছেন সামঞ্জস্য (harmony), সংযুক্তি (bond)

ইত্যাদি। কিন্তু কীসের ঐক্যসাধন? সত্তা ও লোগোস এবারে মিলবে। যা অবভাসিত এবং বিবিধ, তারই একত্রীকরণ এবং ঐক্যসাধন। লোগোস বলতে ছড়িয়ে পড়া ছিটকে পড়া বিশৃঙ্খল প্রকাশমান বহুর মধ্যে একটি ঐক্যকে বুঝতে পারাও বোঝায়। "গ্যাদারিং"-এর অন্যতম অর্থ "আন্ডারস্ট্যান্ডিং"। একত্রীকরণ, ঐক্যসাধন, বুঝতে পারা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়াগুলি চিন্তা ব্যতীত তো সম্ভব নয়। প্রকাশমানতার শর্তই হলো তা চৈতন্যের সম্মুখে প্রকাশমান। চৈতন্যই বিবিধকে একসূত্রে গাঁথে, এবং বিবিক্তও করে। অস্তিত্ব অপর অস্তিত্বের সাপেক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ চৈতন্যের এই ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অস্তিত্বশীল হিসেবে ধরা পড়ে, বাঁধা পড়ে। চিন্তা, এবং প্রকারান্তরে ভাষা ব্যতীত চৈতন্যের এই ক্রিয়া সম্ভব নয়, হাইডেগার ভাষা ব্যতীত চিন্তাকে মানবেন না। তাহলে কি অস্তিত্ব লোগোসেরই নির্মাণ!

অস্তিত্ব বা সত্তার প্রশ্নটি একেবারেই যে অনুপস্থিত ছিল দর্শনের ইতিহাসে, এমনও নয়। অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে প্লেটোর উত্তর ছিল 'আকার' (form), অ্যারিস্টটলের 'দ্রব্য', হেগেলের 'মন'। কিন্তু যে অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলছে, সেই মানুষই যেন বিস্মৃত এইসব অনুসন্ধানে। হাইডেগার যে অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে মানব-অস্তিত্বকেই মেনেছেন, তা আমাদের আলোচনায় উঠে আসছে। হাইডেগার বললেন অস্তিত্বের আলোচনা শুরু হোক মানব-অস্তিত্বের অথর্োদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়েই তবে। এই অথর্োদ্ঘাটন যৌক্তিক অবরোহের মধ্যে দিয়ে ঘটে না, ঘটে প্রতিভাসবিদ্যা (phenomenology) সম্মত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর নীৎশে-পাঠ এবং হুসার্ল সংসর্গের নিশ্চয়ই ভূমিকা আছে এ বিষয়ে। হাইডেগার মানব-অস্তিত্বের নাম দিয়েছেন ডাসাইন। ডাসাইন সে, যে তার অস্তিত্বকে জানতে চায়, বুঝতে পারে। সে নিজে, এমন কি ঈশ্বরও (যদি থাকেন), অনেক অস্তিত্বের অন্যতম মাত্র। কিন্তু একমাত্র ডাসাইনের কাছেই 'অস্তিত্ব' একটা প্রশ্ন হয়ে আসে। ডাসাইন নিছক কার্তেসীয় 'চিন্তক' বা 'চিন্তা' (cogito) নয়, নয় কান্টের 'অহং' (ego)। হাইডেগারের দর্শনের বৈপ্লবিক নিষ্পত্তি অহং—এর ধ্বংস।

অস্তিত্বের ভিত্তি খুঁজতে এসে দেকার্ত পেয়েছিলেন চিন্তককে। চিন্তাকেই করলেন তাঁর দর্শনের ভিত্তি। চিন্তা থেকেই যুক্তিবলে নিঃসৃত হলো ঈশ্বর ও পৃথিবী। কিন্তু চিন্তা এবং জগৎ বিচ্ছিন্ন ও স্বনির্ভর দুটি সত্তা। কান্টের অহং তার বুদ্ধির আকার অনুসারে জগৎ কে জানে, প্রকৃত সত্তা অগোচরেই থেকে যায়। এমনকি হুসার্লও, কান্টের মতোই এক অতিবর্তী অহং (transcendental ego)-এর কথা বললেন, যে গ'ড়ে তুলছে তার অভিজ্ঞতার জগত। এই যে রঙ্গমঞ্চের মতো এক জগৎ, যেখানে মানুষ এলো, কিছু জানলো, কিছু থেকে গেলো অজ্ঞাত এবং তারপর চলেও গেলো এবং মাচাটি পড়ে রইলো পরবর্তী কুশীলবদের জন্যে এই ধারণাটি প্রবলভাবে 'রিলিজিয়স'। জ্ঞাতা মানুষ ও জ্ঞেয় জগতের অনতিক্রম্য আপতিকতা ক্রিশ্চানিটির মধ্যেই নিহিত। হাইডেগার এই বিচ্ছিন্নতার মূলেই আঘাত করলেন। ডাসাইন অহং নয়, ডাসাইন হলো 'জগতে মানব-অস্তিত্ব' (being in the world)। মানুষের অস্তিত্ব আবশ্যিক ভাবেই জাগতিক। কি করে যে দেকার্ত জগৎ বিচ্ছিন্ন

এক বিশুদ্ধ চিন্তাকে আবিষ্কার করলেন!

হুসার্ল নিশ্চিতভাবেই হাইডেগারকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। হুসার্লের প্রতিভাসবাদ (phenomenology)-এর অন্যতম ফসল চৈতন্যের বিষয়মুখীতা (intentionality)-র আবিষ্কার। অভিজ্ঞতালব্ধ আপতিক বস্তু ও ঘটনাবলীর অস্তিত্বকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে হুসার্ল আবিষ্কার করলেন যে জগতের বাস্তবতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করলেও, অস্তিত্বের দাবি নিয়ে বিষয় হিসেবে জগৎ থেকেই যাচ্ছে। আর এই দাবি চৈতন্যের কাছেই। ফলে যা থাকছে তা কার্তেসীয় বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়, থাকছে এক বিষয় আশ্রিত চেতনা। কিন্তু হুসার্ল যা পেলেন, তা কিন্তু বাস্তবতা বর্জিত এক বিশুদ্ধ কাঠামো, যেন এক অতিবর্তী অহং এই কাঠামো অনুসারে জগতকে জানছে। হাইডেগার মানবেনই না যে অস্তিত্বকে এভাবে বন্ধনীর মধ্যে রাখা যায়। বাস্তবতা বর্জিত কোনো অতিবর্তী অহং অকল্পনীয়। চেতনা যে বিষয়াশ্রিত, একথা হাইডেগার অস্বীকার করলেন না। কিন্তু এই কাঠামোর অতিবর্তীতা তিনি মানলেন না। ডাসাইন যুগপৎ নিজেকে এবং জগতকে জানে, নিজেকে জাগতিক ব'লেই জানে এবং যে জগতে নিজেকে খুঁজে পায়, সে জগৎ সন্দেহের উর্দে। বস্তুত দেকার্ত এবং হুসার্ল উভয়েই জগতকে জাগতিক বস্তুর যোগফল ভেবেছিলেন। বুঝতে পারেন নি যে, জগতের বস্তুগুলিকে যদি বা সন্দেহ করা যায়, জগতকে সন্দেহ করা বা তার অস্তিত্বের বন্ধনীকরণ অসম্ভব। আসলে হাইডেগার এখানে এক বিশেষ অর্থে জগতের কথা বলছেন। এই জগৎ ডাসাইনের কাঠামোর আবশ্যিক অংশ। এই অর্থে, অন্য বস্তুদের যেভাবে জগতস্থিত ব'লে জানি, ডাসাইন ঠিক সেভাবেই জাগতিক নয়। ডাসাইন নিজেকে জগতের থেকে আলাদা ক'রে জানে না, জগৎ ও মানব-অস্তিত্ব যুগপৎ জ্ঞাত হয় (এ কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে)। হাইডেগারের পরিভাষায় একেই বলা হয়েছে জগতের জগতত্ব (worldhood)। কান্টের দর্শনে 'দেশ' (space)-এর ধারণার সাহায্যে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্য বস্তুদের আমরা যেভাবে স্থানিক হিসেবে জানি, জ্ঞাতা ঠিক সেভাবেই স্থানিক নয়। দেশ বিভিন্ন বস্তুর স্থানিকতা থেকে আহৃত কোন ধারণা নয়। বরং দেশ জ্ঞাতার বুদ্ধিরই অবদান, তার আবশ্যিক গঠন। সেই জন্যেই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান দৈশিক। হাইডেগারের 'জগতত্ব'ও অপরাপর বস্তুর জাগতিকতা থেকে আহৃত ধারণা নয়, বরং অপরাপর বস্তুর জাগতিকতার উৎস ডাসাইনের কাঠামো (এই কাঠামো আবার হুসার্লীয় অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাঠামো নয়)। আমরা যদি চিরাচরিত ভাববাদ ও বস্তুবাদ (বা বাস্তবতাবাদ) এই দ্বৈতবাদের ছকে হাইডেগারকে বুঝতে চেষ্টা ক'রি, অসুবিধে হবে। উভয় মতবাদেই মন ও জগত-কে পরস্পর নিরপেক্ষ হিসেবে দেখা হয়, কখনও বা কোনো একটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। হাইডেগার মনে করেন মনোনিরপেক্ষ জগৎ বা জগৎ-নিরপেক্ষ মনের কথা বলাই অর্থহীন। কাঠামোগতভাবেই উভয়ে সংযুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিভাসবাদী।

প্রতিভাসবাদ সম্মত দৃষ্টি আয়ত্ত করলে একথাও উপলব্ধ হবে যে ডাসাইনের অস্তিত্ব মূলগতভাবে কালিক (temporal)। এই উপলব্ধি নিছক নিজেকে সময়ে অস্তিত্বশীল হিসেবে

জানতে পারা নয় যেন এক বহমান নৈর্ব্যক্তিক সময়ের কোনো এক ক্ষণে আমি উপস্থিত হয়েছি, চ'লেও যাবো সময়কে ফেলে রেখে। ডাসাইনের কালিকতা আরো গভীর, আরো বুনিয়াদি। ডাসাইন আর কালিকতা অভেদ। পার্থিব সময়, যে সময়কে আমরা কতকগুলো মুহূর্তের যোগফল হিসেবে চিনি, তাকে হাইডেগার বলবেন দৈনন্দিনতার স্থূল সময়, সেই সময় যেন আমার উপর চাপানো হয়েছে। পার্থিব সময়কে লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস। কিন্তু যাকে হাইডেগার যথার্থ বা 'অথেনটিক' সময় বলছেন, তার উৎস আমি নিজে, ডাসাইন। ডাসাইন ইতিহাসের অংশ হয়েও সে ইতিহাসের উৎস। অথেনটিক সময়কে আমি আমার অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে পাই, একে ঘড়ির এককে মাপা যায় না। প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষার যে সময় দীর্ঘতর, সেই একই ব্যাপ্তিকাল হ্রস্ব হয়ে আসে তার ফিরে যাবার আশঙ্কায়। ইতিহাসের অংশ হিসেবে আমি নিছক বর্তমানেই অস্তিত্বশীল, কিন্তু ডাসাইন, যে অস্তিত্বকে জানে, জানতে চায় সে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংশ্লেষ। মুহূর্ত আসলে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনবিন্দু। এই সমগ্রতা নিয়েই ডাসাইনের অথেনটিক সময় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রণিধানযোগ্য, পার্থিব সময়কে আমরা শিখেছি অসীম হিসেবে, কিন্তু যে সময়ের আমিই উৎস, তা সসীম। মৃত্যুই অথেনটিক সময়ের সীমা। ডাসাইনের এই বুনিয়াদি কালিকতার সাপেক্ষেই বুঝতে হবে হাইডেগারের দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "প্রযত্ন" (care) নামক ধারণাটিকে।

ইংরিজি "কেয়ার" শব্দটিকে আমরা বাংলায় শুশ্রূষা অর্থে বুঝি। সে ঠিক আছে, সে অর্থ তো আছেই। কিন্তু "কেয়ার"—এর আরেকটি অর্থও আছে উদ্বেগ। দুটি অর্থই কিন্তু সম্পর্কিত, উদ্বেগ থেকেই তো যত্ন নিই আমরা। প্রদীপের শিখার নিভে যাবার আশঙ্কা থেকেই তো তাকে হাত দিয়ে আড়াল ক'রি। আবার যত্ন বলতে প্রচেষ্টাও বোঝায়। হাইডেগার লক্ষ্য করেছেন মানব-অস্তিত্ব, ডাসাইনের যাপন কিভাবে তার মৃত্যুচেতনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। মৃত্যুপথগামী অস্তিত্বের প্রযত্নের তিনটি উপাদান:

১। মৃত্যুর জন্যে নির্দিষ্ট হ'য়ে আমি জগতে নিক্ষিপ্ত এই বোধ। আমার এই নিয়তি নির্দেশ করছে আমার অতীত। আমার মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে আমার অতীত জন্মমুহূর্তেই।

২। আমার উন্মুক্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, যার একদম শেষে ঘটবে মৃত্যু। মৃত্যু এমন এক সম্ভাবনা যা অন্য সব সম্ভাবনার অন্ত। মৃত্যু ভিন্ন অন্য সব সম্ভাবনা আমার স্বাধীনতার নির্দেশক।

৩। এবং আমার বর্তমান, যেখানে আমি ভঙ্গুর অস্তিত্ব এবং অবহনীয় স্বাধীনতার উদ্বেগ থেকে পালাই, নিজেকে নিয়োজিত ক'রি অপরের সাথে অর্থহীন সংলাপে, হ'য়ে উঠি ভিড়ের একজন। এও আরেক পতন বাস্তবতা থেকে, নিজস্বতা থেকে। নিজের কাছে থেকেই নিজের পলায়ন।

এই যে দৈনন্দিনতার পতনোন্মুখ পলায়নপর আমি, সে আমি অযথার্থ, একজন গড়পড়তা মানুষ, হাইডেগার একে বলেছেন ডাস ম্যান (das man)। সোপপত্তিক চিন্তনে অক্ষম এই মানুষ গরিষ্ঠের আদলে নিজেকে গড়ে তোলে, মনে করে সংখ্যাই গুণ (value)।

ডাস ম্যান ভাষা ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু সে চিন্তক নয়। যদিও হাইডেগার মনে করেন চিন্তা ভাষা ছাড়া সম্ভবই নয়, কিন্তু ভাষা ব্যবহার করছে মানেই সে চিন্তক (rational), এমন নয়। চিন্তাহীন যান্ত্রিকতায় প্রচলিত ভাষার উচ্চারণে আমি ভিড়ের একজন হয়ে উঠি। হুসার্ল যেমন 'অপর' (other)-এর অস্তিত্বের প্রমাণ বা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, হাইডেগার মনেই করেন না তার কোনো প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে প্রথমে আমি নিজেকে পাই, তারপর একে একে জগৎ এবং অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। আমি, জগৎ এবং অপর একটিই চেতনায় যুগপৎ আলোকিত। প্রাক-সোপপত্তিক (pre-reflective) চেতনে অপর জগতেরই মতো ব্যবহারযোগ্য কার্যসাধনী (equipment) হিসেবে ধরা দেয়। কিন্তু অন্যান্য জাগতিক বস্তুর মতো অপর বাধ্য নয়। তাই অনুরোধ, প্রার্থনা, আদেশ, দাবি ইত্যাদির মাধ্যমে অপরকে কার্য সাধনের সহায়ক ক'রে তুলতে চাই (হাইডেগার যাকে বলবেন soliciting) এবং এভাবেই 'অপর' বস্তু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। অস্তিবাদী দার্শনিক মার্টিন বুবার তাঁর আমি ও অপর বইতে সম্পর্কের এই দ্বৈবিধ্য নিয়ে চমৎকার আলোচনা ক'রেছেন। বলেছেন, বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একমুখী, বস্তুতে আমার অধিকার, আমাতে বস্তুর অধিকার নেই। অন্যদিকে মানুষের সাথে সম্পর্ক পারস্পরিকতার দাবি করে। আমি অপরকে এবং অপর আমাকে বস্তুতে রূপান্তরিত ক'রে সম্পূর্ণ অধিকার করতে চায়, কিন্তু পারে না কেউই। তাই অপরে সাথে আমার সম্পর্ক টানাপোড়েনের। বস্তু বা অপর-বিচ্ছিন্ন অহং অপ্রাপ্তব্য। অবশ্য বিশ্বাসী বুবার ঈশ্বরের সাপেক্ষে ব্যক্তির কার্যসাধনী হয়ে উঠতে চাওয়ার কথা বলবেন, হাইডেগার এসব ব্যাপারে নীরব। তিনি বরং ভিড়ে মানুষের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত। অনিবার্য মৃত্যুর উদ্বেগ থেকে বাঁচতে যে মানুষ জনতার নিশ্চিন্ততায় নিজেকে সঁপে দিতে চায়, হাইডেগারের দর্শনে লেখা আছে তার উদ্ধার। অস্তিত্ব আসলে শূন্যতার প্রেক্ষাপটে অর্থবহ হয়ে ওঠে। কারনাপ প্রমুখ ভেবেছিলেন হাইডেগার যে-শূন্যতার কথা বলছেন, তা আসলে কোনো বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে পাই। ভুল ভেবেছিলেন। হাইডেগারের আধিবিদ্যক শূন্যতা ডাসাইন উদ্বেগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে, সে আসলে "কিছু না", তাকে নিরন্তর "কিছু" হয়ে উঠতে হয়। ডাসাইনের এই অন্তর্নিহিত শূন্যতার প্রেক্ষাপটেই অস্তিত্বের প্রশ্ন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। গড়পড়তা মানুষ এই শূন্যতার বোধ থেকে পালায়, আশ্রয় নেয় ভিড়ের নিশ্চিন্ত ছকে। এই ভিড়ের অন্যতম নির্মাতা আমিও, নিজের ভেতরে বহন ক'রি জনতা। নিশ্চিন্ততাই পতন, অনিশ্চয়তাই উদ্ধার। নিজের সম্ভাবনাগুলোকে চিনে নিয়ে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে, সাফল্য এবং ব্যর্থতার দায় বহন ক'রে, মানুষ নিছক গড়পড়তা (existence) থেকে হয়ে উঠবে অথেনটিক (existenz)। অবশ্য অপর বা ভিড় যেহেতু নিছক অভিজ্ঞতালব্ধ আপতিক বাস্তব নয়, ডাসাইন কাঠামোগতভাবেই নিজেকে অপরের বিপরীতে পায়। এবং তাই সর্বাংশে অথেনটিক হয়ে ওঠা অসম্ভব। অথেনটিক না হ'য়ে উঠতে পারার যন্ত্রণাও অথেনটিক অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত। কিয়ের্কেগার্দ এখান থেকেই ঝাঁপ দেবেন এক অন্ধকার গভীর খাদে, যার নীচে কোল পেতে অপেক্ষা করছেন ঈশ্বর।

কিন্তু হাইডেগার বেছে নিলেন কবিতা।

অবশ্য এর পরেও আপনি এই প্রশ্ন করতেই পারেন, "কিন্তু হের হাইডেগার, অস্তিত্ব কি? কিছু আছে কেন আদৌ?"

পাঠ

বিয়িং এণ্ড টাইম, মার্টিন হাইডেগার, অক্সফোর্ড ব্যাসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৭৮

অ্যান ইনট্রোডাকশন টু মেটাফিজিক্স (হোয়াট ইজ মেটাফিজিক্স), হাইডেগার, মোতিলাল বানারসিদাস, ২০০৫

হাইডেগার'স ফিলসফি অফ বিয়িং, হারমান ফিলিপ্স, মোতিলাল বানারসিদাস, ১৯৯৯

আ হিস্ট্রি অফ ফিলসফি (খণ্ড ১১), কোপ্লস্টন, কনটিনুয়াম, ২০০৩

ফ্রম র‍্যাশনালিজম টু এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, রবার্ট সি সলোমন, হারপার এণ্ড রো

আ শর্ট হিস্ট্রি অফ মডার্ণ ফিলসফি, রজার স্ক্রুটন, রুটলেজ, ২০০২

এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, অশোক ভট্টাচার্য, এল ডোরাডো, ১৯৯১

"লোগোস অ্যাজ সিগনিফায়ার", কৌশিক জোয়ারদার, *অ্যানালেক্টা হুসার্লিয়ানা* (সম্পাদক আনা-তেরেসা তাইমেনিয়েচকা), স্প্রিংগার (হাইডেলবার্গ)